রোম্যান্টিক গানের দুই শীর্ষতম আলোক মিনার

সুলেখ ভট্টাচার্য

পাশাপাশি দুটি বই। একটি উপন্যাস, অন্যটি ছোটো গল্পের সংকলন। দীর্ঘ এক কাহিনি সংবলিত প্রথম বইটি, যার মলাটটি অতি দৃষ্টিবিমোহন— জীবন সত্য, সমাজ সত্য এবং সৃষ্টি সত্যের অধ্যায় এনে বিরচিত। পাঠকের ইচ্ছাপূরণের বহু উপাদান সজ্জিত তাতে। একবার পড়া শুরু করলে থামার উপায় নেই। এমনকী একবার পড়ে ফেলার পরও আরো একবার পাঠকও মাঝে মধ্যে চমকে যায়। বইটার কোনো কোনো অংশে তার আচ্ছন্নতা— তাকে কেমন যেন অন্তর্মুখী করে তুলছে, এক ধরনের ভাবাবেশ ডুবিয়ে রেখেছে তাকে। বইটার ভেতরে এমন কিছু আছে, যার আবেদন সহজে ফুরোবার নয়। ...বইটার প্রত্যেক অধ্যায়েই এমন এক কুহকী আলোর চাপা বিচ্ছুরণ, যে বইটাকে মাঝে মধ্যেই নাড়া চাড়া করতে হয়।...

এবার দ্বিতীয় বইটার কথা। তার মলাটখানিই এমন সাদামাটা যে বইটা খুলে পড়ার উৎসাহই জাগতে চায় না। কিন্তু পাতা উলটোতে শুরু করলে, গল্পের পর গল্প, যেমন মনোহারী তেমনি রসগর্ভ— এবার পাঠক টানটান উত্তেজনায় বুঁদ হয়ে পড়ে। সামান্য এক গল্পের বইয়ের ভেতরে একরকম মশলা ও বারুদ যে ঠাসা থাকতে পারে— পাঠক তা অনুমানও করতে পারেনি। গল্পের নামগুলোও জবরদস্ত: 'পৃথিবী প্রশ্ন করে', 'লপক ঝপক তু আরে বদরিয়া', 'শুনশান যমুনা কিনারা', কোনোটা 'আবার হবে তো দেখা' কোনোটা 'কফি হাউসের আড্ডাটা', কোনোটা আবার অদ্ভুত ইঙ্গিতধর্মী 'লাগা চুনরিমে দাগ'—মৃগনাভির গন্ধে যেমন মৃগের নিজের পাগলপারা অবস্থা হয়, গল্পগুলি পড়লে গতে বাঁধা নাগরিক জীবন অভ্যস্ত পাঠকেরও অবস্থা হয় তেমন। সুখদুঃখ মিলিয়ে এমন এক তীব্র নবতর অনুভূতি সহ্য করতে...জ্বালা মেটাতে যে ছুটে যেতে চায় স্বয়ং গল্পকারেরই কাছে... হৃদয় নিংড়ে তার যে কাতর আর্তি গল্পকারের চরণে নিবেদিত হতে চায়, তার ভাষাটিও তার গল্পকারের কাছ থেকেই ধার করা: 'আমার না থাকে যদি সুর, তোমার আছে তুমি তা দেবে...'

পাঠক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনন্য বুঝে দেখেছেন, দুটি বইয়ের মাধ্যমে ভারতীয় লঘু সংগীত জগতের কোন দুজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা বলতে চাইছি। দ্বিতীয় বইটির দ্বারা কোন সে গানের ম্যাজিশিয়ানকে বোঝানো হয়েছে, তা তো পরিষ্কার হয়েই গেছে। কিন্তু প্রথম বইটার মহীরুহ ব্যক্তিত্ব কোন জনা...হয়তো অনুমান করেছেন, হয়তো ইতস্তত করছেন...

ও হো, উপন্যাসটার নামই তো বলা হয়নি এখনও, নামটি হল, 'স্মরণের এই বালুকাবেলায়'— কী? নীল আকাশের নীচে যে পৃথিবী, তার মুছে যাওয়া দিনগুলির কথা মনে পড়ছে এবার? মনে পড়ছে সেই গানের স্বরলিপি লেখা মানুষটির কথা? এই দুই সংগীত যোদ্ধার দ্বৈরথের কথাই শোনাব এখন।...ঠিকই, মিল যত, অমিলও কম নয় এই দুয়ের মধ্যে। আসুন, প্রবেশ করা যাক রণভূমিতে।

মিল এই, দুজনেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের কণ্ঠ শিল্পী। দুজনেই বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের সমকালীন সংগীত প্রতিভা। উভয়েই মুম্বাই এবং কলকাতার স্বনামধন্য সুরশিল্পী। শুধুই কণ্ঠসংগীত নয়, সুরও রচনা করেছেন। নানা স্বাদের। ফিল্মি বা ননফিল্মি আধুনিক গানের জগৎ থেকেই উভয়ের যাত্রারম্ভ, পরে সংগীতের দিক দিগন্তে উভয়েরই বিস্তার। কেউই সাধারণ মানের এক দুই দশকের সুকণ্ঠ শিল্পী মাত্র নন। লঘু সংগীত জগতের সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ের একাধিক কীর্তি স্থাপনের অধিকারী, তো অন্যজন জীবনের দ্বিতীয় পর্ব থেকে প্রধানত কণ্ঠশিল্পের উৎকর্ষে জনমন জয়ী, রসিক চিত্তজয়ী, সংগীত সমালোচকগণের দ্বারাও বহু প্রশংসিত। উভয়েই মাতৃভক্ত, ঈশ্বর বিশ্বাসী, আড্ডাপ্রিয়, একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য এবং পরস্পরের গুণমুগ্ধ।

একজনের নামে আভিজাত্যের এবং রোমান্টিকতার অদ্ভুত মিশেলে। অন্যজনের নামে যেন ইচ্ছাকৃত স্মার্টনেসের আরোপিত আধুনিকতা। একজনের নাম পিতামাতার দেওয়া। অন্যজনের নাম বদলে যেতে যেতে, একসময়ে স্থিরতা পায়। একজন হলেন হেমন্ত, কণ্ঠে যাঁর চার দশক জুড়ে বসন্তের সুবাতাস। অন্যজনের নাম মান্না; ভিতু বাঙালি, নির্বিরোধী বাঙালি, ভদ্র বাঙালি এবং ভ্যাদভেসে অসল বাঙালির বিপরীত বিন্দু থেকে উঠে আসা এক দুরন্ত চ্যালেঞ্জের নাম।

একজন বাঙালিয়ানা ও আভিজাত্যের শেষ কথা। ছয় ফুটের ওপর দীর্ঘ, সৌম্য দর্শন, ধুতি শার্ট পরা আপাদমস্তক মধ্যবিত্ত বাঙালি হয়েও কর্মজীবিকার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাহেব— সমকালে, কর্মনিষ্ঠায়, পেশাদারি কর্মকুশলতায় দৃষ্টান্ত বিশেষ। ফিল্মি সংগীত পরিচালনায় গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে ইনি

এক সমীহ জাগানো ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রসংগীত জগতেরও মধ্যমণি ইনি। দক্ষিণ কলকাতায় বেড়ে ওঠা, শিল্পসাহিত্যের বিশিষ্ট অনুরাগী, প্রগতিবাদী, রাজনৈতিক বিশ্বাসে আস্থাশীল এই শিল্পী, দীর্ঘকাল শিল্পীর স্বার্থ রক্ষায় নেতৃত্বদাতাদের একজন। এককথায় বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই এঁর গানে আবিষ্ট। মধ্যবিত্ত বাঙালির শ্রদ্ধা সমীহ মর্যাদা বোধের চূড়াস্থিত নায়কোচিত সুরশিল্পী ইনি। বঙ্গীয় শিল্পীকুলে সংগীত বাণিজ্য বিপণনে ধারাবাহিক সর্বোচ্চ রয়্যালিটির অধিকারী লঘুসংগীত সাম্রাজ্যের এই মুকুটহীন সম্রাট। লঘু সংগীতের স্বর্ণযুগ যাঁদের বিশিষ্ট অবদানে রূপ লাভ করে, সেই ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ -এর 'কিংবদন্তি' এই হেমন্তকুমার অথবা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সামাজিক বিচার সত্যে, বাঙালি জাতির মানসে সত্যজিৎ রায়-রবিশঙ্কর-উত্তরকুমার-উদয়শঙ্কর বা পি. সি. সরকারের মতোই এক 'আইকন'।

অন্যজনের বেড়ে ওঠা উত্তর কলকাতার বনেদি পাড়ায়, প্রসিদ্ধ সংগীত বংশে। দৈর্ঘ্যে ঈষৎ খর্বাকৃতি। দীর্ঘকাল মাথা ঢাকা টুপিতে কতকটা শেঠজি দর্শন, প্যান্ট শার্ট পরিহিত, ব্যায়ামপুষ্ট প্রাণশক্তিতে চনমনে এক বাঙালি তরুণ। নব্বই বছর বয়সেও হাজার হাজার শ্রোতার সামনে সংগীত পরিবেশনে অক্লান্ত এক বিশ্ব রেকর্ড গড়া অদৃষ্টপূর্ব সংগীত ক্রীড়াকুশলী। ফিল্মি সংগীত পরিচালনায় প্রথমজনের মতো এঁর সিদ্ধি বা সুনাম বিস্ময় বিমোহক নয়। আপন গানে বিশেষত ব্যথার আরতিভরা সুর রচনাতে তাঁর কৃতিত্ব যদিও বাঙালি আত্মার শান্তির কারণ। 'টিনএজ' প্রজন্মের কাছে তিনি গুরু রূপে বন্দিত, নানা নিজস্বতার গুণেই। অন্যদিকে তিনি ভার্সেটাইল সংগীত শিল্পী রূপেও ভারতবন্দিত। লঘুসংগীত জগতের সর্বশীর্ষ দুই সমকালীন ব্যক্তিত্ব বাংলার হেমন্ত এবং বোম্বের মহঃরফিক তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে একাধারে যদি কোনো শিল্পীকে চিহ্নিত করতে হয় তো তিনি এই মান্না দে; কণ্ঠের ঈষৎ কোমলতা বশত যিনি নায়ক লিপে সেভাবে গ্রাহ্য না হবার কারণে কিঞ্চিৎ ভাগ্যহত— কিন্তু সংগীত সামর্থ্যে তিনি অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবু যখন তর্ক ঘনায়, রফিক পর কিশোর নাকি মুকেশ নাকি মান্না...তখন সোচ্চারে বলতে ইচ্ছে করে, 'আগুন', লেগেছে লেগেছে...'?

হেমন্ত না মান্না— সংগীত পাগল বাঙালির এই তর্কের বয়সও দেখতে দেখতে চার-পাঁচ দশক হতে চলল। তবু এই তর্ক চলমান। অথচ এই তর্কের সত্যিই তেমন গুরুতর কারণ নেই। একজনের যদি কণ্ঠে সৌন্দর্য অপরিমেয়, তো অন্যজনের সাংগীতিক দক্ষতা ভয়াবহ রকমের বেশি। একজনের কণ্ঠ গাম্ভীর্যে, সংগীত পরিমিতিবোধে, রুচি সৌকর্য মণ্ডিত ভাবাবেশে যদি ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত তৃপ্ত তো অন্যজনের দাপুটে সাংগীতিক ঐশ্বর্য সম্ভারে তৃণ থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত তটস্থ সন্ত্রস্ত। একজনের আন্তঃসত্তা সংগীতের অনুসন্ধানী গবেষক, ধারক, বাহক, প্রচারক। অন্যজনের বহিঃসত্তায় সংগীত যেন সুরসিক ফেরিওয়ালা, স্পর্শে গন্ধে বর্ণে ছন্দে যার বর্ণবিভা অফুরন্ত। হেমন্ত যেন একটাই গান গেছেয়েন সারাজীবন জুড়ে— যে গান আকাশের, আলোকের, অনন্তের, অখণ্ডের। কিন্তু মান্না দে-র গান খণ্ড খণ্ড, অস্থির আনন্দের। অভিনবের এবং অভিভূতেরও। হেমন্তের গান যদি পথিকের থেকে পথে; মান্নার গান তার বিপরীত মুখী— পথ থেকে পথিকের। মান্না বিশেষ তো হেমন্ত নির্বিশেষ। কে যে কাকে কখন কীভাবে কোন সত্যের মৌলিক বিশেষত্বে অতিক্রম করে গেছেন, বহু তর্কেও তার মীমাংসা হয় না। উভয়ের সংগীত ভূমির অবস্থান অনেকটাই আলাদা।

আসলে বহু যুগের নায়ক হেমন্তকে আপন পরিচয় গড়ে তুলতে হয়েছে, বহু রক্তক্ষরণ সয়ে। যে পঙ্কজ মল্লিককে, হ্যাঁ, নিউথিয়েটার্সের কিংবদন্তি সুরশিল্পী অভিনেতা সংগীত গুরু রবীন্দ্রসংগীতাচার্য পঙ্কজ মল্লিককে, হেমন্তও গুরু মানতেন, অনুসরণ করতেন তাঁরই গায়কী, একসময় যখন বুঝলেন, গুরুর অভিজ্ঞান ছিন্ন করে তিনি আত্মপরিচয়হীন, নিজেকে নতুনভাবে গড়া শুরু হল তাঁর আরো এক সংগীত গুরু রূপে যে শৈলেশ দত্তগুপ্তের ট্রেনিং-এ তাঁর প্রথম চার পাঁচ বছরের আধুনিক গানের ডিস্ক রেকর্ড প্রকাশ, একসময় তাঁর সুরকে একপাশে সরিয়ে রেখে যুগপরিবর্তনের চেতনায় নিজের গানের সুরও নিজেই গড়ে নেওয়ার উদ্যোগও তাঁর। কাব্যবাণীর নবভুবন সৃজনে গীতিকার রূপে গৌরীপ্রসন্নের মতো সম্ভাবনাময় গীতিকারকে নির্বাচন ও তার আধুনিক বাংলা গানের বহু শিল্পীকণ্ঠ ঝংকৃত রাজপথে ও রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি সিনেমার গানেও রাজপুত্রের ভূমিকায় যখন হেমন্তের এহেন আত্মপ্রকাশ— তখন তাঁর বয়স মাত্রই চব্বিশ-পচিশ বছর।

কিন্তু আবির্ভাব লগ্ন থেকে সংগীত সৌধে বিজয় পতাকা উত্তোলন, ১৯৪৪-৪৫ থেকে ১৯৫৪-৫৫; কত যে বিচিত্র পথের বাঁকে তাঁর 'আরোহণ', কাহিনি, অচেনা রূপকথার অশ্রু আলোক ছড়ায়, সে ইতিহাস যেমন তেমন লেখনী সাধ্য বর্ণনীয় বিষয় নয়। একদিকে পঙ্কজ প্রভাব কাটিয়ে ওঠা, অন্যদিকে সায়গল

জমানার সর্বব্যাপ্ত প্রভাবকে সাধ্যমতো প্রতিহত করা, সমকালীন আরো দুই বিশিষ্ট সেরা শিল্পী জগন্ময়-ধনঞ্জয়কে উত্থান পর্বের সেই মোহমেদুরতাকে মেনে নিয়ে আপন গানের 'ভুবন' গড়ে তোলা; কমল দাশগুপ্ত-অনুপম ঘটক-রবীন চট্টোপাধ্যায়-সলিল চোধুরীদের মতো সুরকারগণের পাশাপাশি নিজস্ব সংগীত পরিচালক সত্তার প্রতিও সুবিচার করা– এবং তার পরও মুম্বাই জগতের বিশালতর প্রেক্ষাপটে আপনায় নিহিত সুরশিল্পী সত্তার দ্বিমুখী সামর্থ্যকে প্রমাণ করা; সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের মহত্তর ঐশ্বর্যসম্ভারের সঙ্গে বিশেষত বাঙালি জাতির প্রাণের বিনিময় ঘটনাটিকে সম্ভব করে তোলা– পঙ্কজ মল্লিকের যোগ্য উত্তরসুরী হেমন্তর সংগীত পৃথিবীর কর্মদিগন্ত ছিল বহু প্রসারী, ছিল নিত্যনব রোমাঞ্চে ভরা।

এই হেমন্তই যখন আবার আরেক স্বর্ণকণ্ঠ শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে উত্তম-সুচিত্রা পর্বের রোমান্টিক চিত্রগীতির মুখ্য পুরুষ কণ্ঠ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, বাংলার বুকে রচিত হয় ফিল্মি গানের নতুন ইতিহাস। 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবির গানে যে স্বর্ণবৈভবের সংকেত, হেমন্ত সুরারোপিত 'শাপমোচন' -এ যার অভাবনীয় বিস্তার, বাংলা সিনেমার গানে এভাবেই উদঘাটন হয় 'নবজাগরণে'র। প্রসঙ্গত বলা দরকার,এ পর্বের শরুটা যদিও 'সমাপিকা' ও 'শ্রীতুলসীদাস' ছবির গান থেকেই সূচিত হয়েছিল। ...সেদিন সমস্ত গান যেন সিনেমা মুখী, সমস্ত সিনেমা যেন সুচিত্রা-উত্তর অভিমুখী, সমস্ত উত্তর সুচিত্রাই হেমন্তর - সন্ধ্যাময়, সমস্ত সুরে কথায় যেন রবীন চট্টোপাধ্যায় - হেমন্ত মুখোপাধ্যায়- নচিকেতা ঘোষ ও গৌরীপ্রসন্নের অনিবার্য উপস্থিতি। চন্দ্রদ্যুতিময় মায়ামোহে গড়া সে গানের লগ্ন হয়তো বা শতবর্ষে একবারই আসে। অভিনয় শিল্পের আবেগ মাধুর্যও বোধহয় এমন তুঙ্গস্পর্শী হয় বহু ভাগ্যে। দেশভাগ লাঞ্ছিত, বহু যাতনায় বিড়ম্বিত, বহু আশায় উদ্দীপিত সেই বিশেষ সময়বৃত্তে বাঙালি শ্রোতা দর্শকের আবেশ মুগ্ধতা যেন কাটাতেই চায় না কিছুতেই।...

তা হলে মান্না দে? বাংলা ছেড়ে বাঙালি ছেড়ে, উত্তম - সুচিত্রা থেকে দূরবর্তী হয়ে যিনি আরবসাগারের তীরে খেমচাঁদ প্রকাশ, শচীনদেব বর্মন এবং পিতৃব্য সংগীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সাহচর্যে তিলে তিলে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন যিনি মাতৃভাষা বাংলায় নয়, হিন্দি ভাষায় গান গেয়ে প্রথম রেকর্ড করলেন, তৎকালীন বোম্বাই নায়ক শ্রেষ্ঠ রূপে, প্রতিষ্ঠিত দিলীপ কুমার-দেবানন্দ বা রাজকাপুরের লিপে গাইতে না পাওয়া সত্ত্বেও, একসময়ে কেবল ভক্তিগানের গায়কের তকমা স্বীকার করে নিয়েও ১৯৮৪-৫০ সাল থেকে অনিল বিশ্বাস-শচীনদেব-শঙ্কর জয়কিষাণ-শ্রীরামচন্দ্র-মদনমোহন বা সলিল চৌধুরির মতো সর্বোচ্চ সুরকারগণের সুরে অবিশ্বাস্য দক্ষতার পরিচয় রেখে মাতিয়ে দিলেন ভারতীয় শ্রোতার মন নতুনতর স্টাইলে, বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশনে, দাপুটে দক্ষতায়—তাঁর কণ্ঠ থেকে কি বাংলা ছবির দর্শক বঞ্চিতই থেকে যাবে? কীভাবে ভাঙবেন তিনি উত্তম-সুচিত্রা-সন্ধ্যা-হেমন্তময় গানের সে অমরতাস্পর্শী প্রহরকে? আধুনিক বাংলা গানের অসামান্য সব উপহারও যখন সেই স্তরের অভিনন্দন লাভ করতে পারছে না, তখন তো তাঁর কাছে বাংলা গানের সিংহদ্বারটি চিররুদ্ধ অনড় অটল বলেই মনে হতে বাধ্য।

বস্তুত ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬, ধারাবাহিক পনেরো বছরে মান্না কণ্ঠের শ্রেষ্ট বেসিক 'আধুনিকগান'গুলি বছরে বছরে প্রকাশিত হয়ে চললেও, বাংলা ছবির গানের দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত হয় মাত্রই পনেরো কুড়ি বার। হেমন্তর তো কথাই নেই ধনঞ্জয়, শ্যামল, মানবেন্দ্র বা রাগপ্রধান গানের প্রসূন ব্যানার্জি তখন নিয়মিত গাইছেন বাংলা ছবিগুলিতে, কেবল মান্না দে-ই যেন তখনও 'অনাদৃত একজন, অনেক দোষেতে দোষী' সেই শিল্পী— যিনি নিজেকে প্রমাণেরই কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না সেভাবে।

অথচ ততদিনে বোম্বাইতে তিনি, রফি, তালাত, হেমন্তের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানের বছর তিন-চারের ক্রমানুসারী চিত্রটিকে বদলে দিয়েছেন। অনিবার্য ভাবে উঠে এসেছেন রফির পরই দ্বিতীয় স্থানে এবং তাঁর সংগীত দক্ষতার বহুমুখী ঐশ্বর্যে মুগ্ধ শঙ্করজয়কিষণ তাঁদের সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ কিছু নিবেদনের জন্য মান্না কণ্ঠকেই বেছে নিয়েছেন নির্ভুল সিদ্ধান্তে; হেমন্তকে সঙ্গে করে যে সলিল বাংলায় গড়েছেন বাংলাগানের মোড় ফেরানো ইতিহাস, তিনিও তাঁর বোম্বাই অভিযানের প্রথম পর্ব থেকেই মান্না কণ্ঠের অবিশ্বাস্য রেঞ্জ, মমস্পর্শী দরদ, সংগীত পরিবেশনের মায়াবী আবেগকে কাজে লাগিয়ে চমকে দিয়েছেন শ্রোতা সাধারণকে; আর আপাত নিরীহদর্শন, অথচ সংগীত সাম্রাজ্যের বহু অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ রসগর্ভ শচীনকর্তা, সুযোগ বুঝেই লড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর অতি প্রিয় দুই শিল্পী মান্না-হেমন্তকে বোম্বাই ছবির গানের রাজ্যে 'দুইজনাকে দুইখান' মোক্ষম গান উপহার দিয়ে। মান্নার জন্য বহু প্রতীক্ষার শেষে, তাঁর সেই আকাশচুম্বী সুরের চুম্বক হল: 'উপহার দিয়ে। 'উপর গগন বিশাল, নীচে গহেরা পাতাল'; আর হেমন্তের

জন্য আকাশচুঁইয়ে পড়া সুরের গলিত রৌপ্য ধারা: 'ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনি ফির কঁহা'—হিন্দিগানের জগতে উভয় শিল্পীর আবির্ভাব লগ্নকে করেছে স্মরণীয়, বরণীয়, মহাউত্তেজক বারুদে ঠাসা।

কিন্তু বঙ্গভূমিতে লড়াইটা শুরু হল বহু পরে। উত্তম - হেমন্ত জুটির ম্যাজিক যখন ঈষৎ ম্লান, হেমন্ত-সন্ধ্যা জুটির জয়যাত্রার বর্ণালীও যখন বহুশ্রুত, তার পরে পরে যখন প্রতিমা-আরতির উত্থান নতুন কোনও গানের পালা লিখতে উন্মুখ, হেমন্তের গানের স্বরলিপি লিখে ফেলার পর অথবা তার কিছু আগে পরে শ্যামল - মানবেন্দ্র - সতীনাথ- অখিলবন্ধু - তালাত- দ্বিজেন-তরুণ-মৃণাল-সুবীর প্রমুখ যখন নতুন সুরের নতুন স্বাদের নানা গান উপহার দিয়ে চলেছেন, সুধীন- নচিকেতা-অখিল বাগচির মতো সুরস্রষ্টাগণ খঁজছেন নতুন ভঙ্গি, নতুন গানের চেহারা, সেই লগ্নে মান্না দে'র আগমন ঘটল 'আগন্তুক' -এর মতো। তিনি কঠিন অঙ্ক এক কষতে দিলেন। নতুন গীতিকারের কলমে, নতুন সুরের অভিনয় রঙে রাঙা নতুনতর স্টাইলে। বহু যুদ্ধের মহিমময় সংগীত নায়ক হেমন্তকে অতিক্রম করে আপন গানের নিশান ওড়াতে, মান্না দে নিজেকে গড়লেন সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষায়; যুগের চহিদাকে মেনে নিয়ে, মান্না দে'র বাংলা গানে অভিযান শুরু হল, অনেক গানের রংরূপ রস রীতিকে ভেঙে চুরে; রাগ - পপ-ভজন--গজল-লোকসংগীত-কৌতুক-অথবা কৌলিন্যবাদী কাব্যগীতির মিশেলে মান্না দে-ই হয়ে উঠলেন যুগের নায়ক গায়ক।' ৭০ সংলগ্ন বাংলা গানের অন্যান্য মুখ্য কণ্ঠস্বরগুলির, যথা, কিশোর-ভূপেন-পিন্টু, অনুপ, পল্লব ও সঞ্জয়ের যথার্থ সমীহ স্থান হয়ে উঠলেন মান্না দে-ই। আবার হেমন্ত কণ্ঠ প্রচ্ছায়া, শচীন গুপ্ত, তরুণ ব্যানার্জি, দ্বিজেন্দ্র মুখার্জি, সুবীর সেন, দীপঙ্কর চ্যাটার্জি, পরে শিবাজী চ্যাটার্জি, ব্রহ্মতোষ চ্যাটার্জি, জয়ন্ত দে, শক্তিব্রত দাস প্রমুখ। অন্যদিকে সর্বভারতীয় স্তরেও তাঁর নানা - গানের অভিযান চলতে থাকল। মান্না - উত্তম, মান্না-সৌমিত্র, মান্না-পুলক, মান্না-সুধীন, মান্না-নচিকেতা, মান্না-প্রভাস দে, মান্না-সুপর্ণকান্তি, মান্না-দীপঙ্কর, মান্না-অজয়, মান্না-মৃণাল — নানা স্বাদের মান্না মদের নেশায় উত্তাল হয় বাংলা।

মান্না দে-র বৈশিষ্ট্যে না হলেও একদিন আপন সামর্থ্যেই, সমকালীন গানের খোলনলচে বদলে দেওয়া হেমন্ত ছিলেন বাঁধা গতে শিল্পের সাধনা না করা, এক স্বশিক্ষিত শিল্পী, আপন কৃতিত্বেই যিনি হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গানের বাণিজ্যিক ধারার রুচি নির্ণায়ক প্রধান ব্যক্তিত্ব, হাজার হাজার মঞ্চানুষ্ঠানের অদ্বিতীয় শিল্পী রূপে যিনি বাংলায় সংগীত সংস্কৃতির ঘরানাকে এক উচ্চমানে বাঁধবার কৃতিত্বেও হয়েছেন অবিস্মরণীয়।...বঙ্গীয় সংগীত উপন্যাসের তবু তিনি সেই নায়ক, যিনি জানতেন, সংস্কৃতির বহতা স্রোত কখনো স্থির থাকতে পারে না। পালা বদলের পালা আসতেই পারে, তাই বলে আপন কর্মে ও দায়বোধে উদাসীন থাকলে চলে না। অতএব, গীতিনাট্যের গানে, আকাশবাণীর রম্যগীতিতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গানে, ইংরেজি ছবির সংগীত দানে রবীন্দ্রগানের গৌরব ভূমির পাশাপাশি দেশবন্ধুর বা রজনীকান্তের গানে, যাত্রাপালা, গীতিআলেখ্য ও অসংখ্য বাংলা ছবিতে কণ্ঠদানে ও সুর রচনায়, নন্ - ফিল্মি বাংলা ও হিন্দি গানেও কণ্ঠদান করে, চিত্র প্রযোজনায় এমনকী 'অনিন্দিতা' ছবির পরিচালনাতেও তিনি তাঁর সংগীতময় জীবনের নব নব দিগন্ত প্রসারিত করে চলেন। কিন্তু ভোলেন না, অতি প্রবীন তথাপি, আশ্চর্য নবীন সেই গায়কটির কথা, যিনি নতুন কালের উপযোগী গান গাইবার প্রয়োজনে নিজেকে নবতম আয়ুধে সজ্জিত করে বাণিজ্যিক ধারার গানের দরজায় করাঘাত করে বলেন, কখনো অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির কবিগান নিয়ে, কখনো শঙ্খবেলার মিলনমোহনায়, কখনো নিশিপদ্মের অচেনা সৌরভে।...এ এমন এক দুর্গম পথের সৈনিক সারথি, যার কাছে অসম্ভবের আনন্দ অপরিসীম। পালাবদলের পালায়, নতুন পালাকারের জন্য, অনাগত দিনে ভোরের ভৈরবীর সুর, চিরদিনই নতুনের পূজারি হেমন্ত বেঁধে দিয়ে যান গভীর দরদে: 'দুটি মন' সিনেমায় মান্না দে এক অমরতাগন্ধী গান গাওয়ানোর সূত্রে:

'জাগো, নতুন প্রভাত জাগে, সময় হল
জাগো নব দিনমণি, অন্ধ তিমির দ্বার, খোলো হে খোলো'

কতবারই না বেজেছে এ গান, বিগত তিরিশ চল্লিশ বছর যাবৎ, তবু আজও এ গান শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে যায়। মনে হয়, লঘুসংগীত সাম্রাজ্যের অধিপতি সুরলোকের সুরপতি, হেমন্ত, তাঁর পরবর্তীকালের গানের সাম্রাজ্যের ভার, তাঁর দীর্ঘকালের সহযোদ্ধা মান্না দে-র হাতেই তুলে দিয়ে যান, এই আশায় যে, আরও কঠিন দিনের বুকে, অ-সুরের অন্ধতিমির দ্বার যেন সুরের মায়াবাহুকেই উন্মোচিত করেন।